দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 2013
পৃষ্ঠা 1 কলাম

ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন

গত কয়েক দিনে ইত্তেফাকের মফস্বল পাতায় বেশকিছু এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ ও জীর্ণশীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের সচিত্র খবর প্রকাশিত হইয়াছে। সেসব বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাইতেছে। এসব জরাজীর্ণ ভবন যে কোন সময় ভাঙিয়া পড়িতে পারে তাহাদের মাথার উপর। দেখা দিতে পারে যমদূত রানা প্লাজার ন্যায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা। বিশেষত মেঘ-বৃষ্টির সময় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিরাজ করে আতঙ্ক। ছাদ দিয়া পানি পড়ার কারণে দুর্ভোগের কোন অন্ত থাকে না। এই সময় বইপত্র ও আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে সকলেই। অনেক ভবন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু পুনঃনির্মাণের নাম নাই। এইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ ভবনগুলির দুরবস্থার কথা জানাইয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়েই অবহিত করেন। সেই অনুযায়ী স্থানীয় এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিস তালিকা প্রণয়ন করিয়া প্রতিবেদন আকারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও পাঠাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পরও গ্রহণ করা হয় না দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ।

শিশু-কিশোরদের উপরোক্ত দুর্ভোগের চিত্রটি যে কাহারও মনে মায়ার উদ্রেক না করিয়া পারে না। কিন্তু তাহাতেও সময়মত প্রশাসনের টনক নড়ে না। যেমন- টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টি স্কুলভবন ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলে তো বটে, খোদ পৌরসভার মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা বিদ্যমান। আবার শুধু মির্জাপুরেই নহে, শৈলকুপা ও লাঙ্গলকোটসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। সরকারি এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন আছে ৮৩ হাজার। এই হিসাবে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। ভবনগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়া নির্মাণের কারণে এই হতদশার সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নমানের কাজের জন্য কয়েক মাস না যাইতেই অনেক স্কুলভবন ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া যাওয়ার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার ১৬টি প্রাইমারি স্কুলভবন নড়বড়ে হইয়া পড়িয়াছে। স্কুলগুলি নির্মিত হইয়াছে ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। এলজিইডি নির্মাণ করে এই ভবনগুলি, যাহা এযাবত বৎসর ব্যবহারের নিশ্চয়তা ছিল। এখন কেন এরূপ হতদশার সৃষ্টি হইল তাহার জন্য জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নাই। জবাবদিহিতা থাকিলে এই রকম শত শত ঘটনা বারংবার ঘটিত না। বানরের পিঠা ভাগের ন্যায় বরাদ্দকৃত অর্থের নয় ছয় হতো না।

সার্বজনীন শিক্ষার প্রসারে প্রতিটি সরকারই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভগ্নদশার স্কুলভবন নিয়া কিভাবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব? এরূপ ভবন প্রায় ৯ শতাংশ হইলেও ইহা নেহায়েত কম নহে। প্রথমত স্কুলভবন জরাজীর্ণ থাকিবে কেন? পত্র-পত্রিকায় সচিত্র খবর প্রকাশিত হইবার পর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে কিংবা ছাদ ধসিয়া পড়া পর্যন্ত কেনইবা অপেক্ষা করিতে হইবে? দ্বিতীয়ত দেশের সবখানেই জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় লোক প্রশাসনের কর্মকর্তারা আছেন। তাহারা যথাসময়ে বিষয়টির আবশ্যিকতা সেভাবে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা কেন্দ্র হইতে যথাযথ অর্থ বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন হইতে পারে। এ ব্যাপারে সোচ্চার ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য সকলকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। স্কুলভবন সংস্কার ও অন্যান্য অবকাঠামোগত খাতের উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি ও বেসরকারি বাজেট থাকা চাই। স্কুলগুলি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নানাভাবে নিজেদের আয় বৃদ্ধিরও চেষ্টা করিতে পারে। সব ক্ষেত্রে সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকাও সংগত হইবে না। আবার সরকারও এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা প্রদর্শন করিতে পারে না।